আসিফ মেহ্‌দী

ব্ল্যাকহোলে হট্টগোল

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ছে। বাসাতে নানা বয়সি ছাত্রছাত্রী—কারো চলছে হাতেখড়ি, কেউ বুঝছে মহাকর্ষ সূত্র, কেউবা কষছে ক্যালকুলাস। যত্ন নিয়ে আব্বু সবাইকে পড়াচ্ছেন। বিকেলে নাশতাপর্ব—মামণির হাতে মাখানো চানাচুর-মুড়ি বা তেলেভাজা পিঠার আয়োজন। ছোটোদের শিক্ষার প্রতি আব্বুর ভালোবাসার কারণে আমাদের বাসায় ছিল লেখাপড়ার নিত্য আয়োজন। নাম ফুলকুঁড়ি। ফুলকুঁড়ির ছাত্রছাত্রীরা এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। মহাকাল বয়ে যায়, কিছু স্মৃতি রয়ে যায়। ফুলকুঁড়ির দিনগুলো মনে পড়ে।

ফুলকুঁড়ির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

ভূমিকা

অক্সফোর্ডে ভীষণ ব্যস্ততাপূর্ণ দিন কাটছে। যে নদীতে বিজ্ঞানী হকিং নৌকা চালিয়েছেন, সেটির তীরবর্তী একটি লাইব্রেরির বদ্ধ কক্ষে (ক্যারেল বলা হয়) একাকী লেখাপড়া ও লেখালেখি করছি। ব্যস্ততায় থাকলে কেন যেন স্মৃতিকাতর হয়ে উঠি। এক ঝলক রোদ এসে ঢুকেছে আমার ক্যারেলে। রোদ আমাকে নিয়ে গেল বহু বছর আগের দৃশ্যপটে—শৈশবের কোনো এক রোদেলা সকালে। চারতলায় বাসার বারান্দায় আব্বুর কাছে পড়তে বসেছিলাম। ছুটির সেদিন এক বসাতে শিখেছিলাম ন্যারেশন ও ভয়েস চেঞ্জ। আব্বুর কাছ থেকেই শিখেছি গণিত ও বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি; পেয়েছি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের পথে আজীবন হেঁটে চলার প্রেরণা।

'ব্ল্যাকহোলে হট্টগোল' বিজ্ঞানের পথে দৃপ্ত শপথে এগিয়ে যেতে যদি তোমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, তবেই শ্রম সার্থক হবে। আগ্রহ ও যত্নের সঙ্গে বিজ্ঞানবিষয়ক বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় কথাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী জনাব জসিম উদ্দিন এবং প্রকাশনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আসিফ মেহ্‌দী
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

সূচি

আবিষ্কারের পেছনের মজার গল্প	১১
কিংবদন্তি বিজ্ঞানীর সঙ্গে একবেলা	১৮
তারকাকথন	২৮
ব্ল্যাকহোলের খোঁজ—দ্য সার্চ	৩৫
ব্ল্যাকহোলে হট্টগোল	৪২
হট্টগোলে তালগোল	৪৮
হট্টগোলে আরও গণ্ডগোল	৫৩

আবিষ্কারের পেছনের মজার গল্প

পৃথিবীর নানা আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান কল্পগল্পের অবদান। সায়েন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পগল্পের মাধ্যমে আমরা সেসব ঘটনাও জানতে পারি, যেগুলো ভবিষ্যতে ঘটা সম্ভব কিন্তু বর্তমানে ঘটছে না! বাক্যটি যে কত বড়ো সত্য, তা একটু পেছনে তাকালেই বোঝা যায়। বর্তমানের ক্রেডিট কার্ড, ট্যাব, ডুবোজাহাজ, চালকবিহীন গাড়ি, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বাড়িঘর নির্মাণে থ্রি-ডি প্রিন্টারের ব্যবহার, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইটের ব্যবহার ইত্যাদি অসংখ্য আইডিয়া অনেক আগেই বর্ণিত হয়েছে সায়েন্স ফিকশনের বইগুলোতে বা চলচ্চিত্রে। অর্থাৎ এককালে সায়েন্স ফিকশন বইয়ে বা চলচ্চিত্রে যা ছিল শুধু কল্পনা, আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে!

একইভাবে বলা যায়, বর্তমানে যা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আগামীতে তা-ই বাস্তবে আবিষ্কৃত হতে পারে। সুতরাং অল্পস্বল্প বিজ্ঞান কল্পগল্প দিতে পারে অতিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দেখা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্রের ওপর ভর করে সায়েন্স ফিকশন বা সাই-ফাই লেখকদের কল্পনার জগৎ নির্মিত হয় বলে কল্পনাসমগ্র পরে বাস্তবে রূপ নিয়েছে, নিচ্ছে বা নেবে। সায়েন্স ফিকশন বই বা চলচ্চিত্রের কাহিনিতে বর্ণিত কোন কোন কাল্পনিক বস্তু পরবর্তীকালে বাস্তবে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব মজার গল্প নিয়ে প্রথম লেখাটি।

মহাবিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে ভাঙলে শেষমেশ একই প্রজাতির মৌলিক কণা অর্থাৎ ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব মৌলিক কণার বিভিন্ন বিন্যাসের মাধ্যমে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু—খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ির ইট-বালু-সিমেন্ট, কক্ষের ভেতরের চেয়ার-টেবিল সব কিছু একই মৌলিক কণার সম্মিলনে তৈরি! এ ধারণাকে প্রথম টেলিভিশন পর্দায় তুলে আনে বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'স্টার ট্রেক'। সেখানে দেখানো হয় 'রেপ্লিকেটর' নামের একটি যন্ত্র, যা কমান্ড শুনে তৈরি করে দিতে পারে যে-কোনো খাদ্যবস্তু। শুধু খাদ্যবস্তু কেন, যে-কোনো বস্তু তৈরি সম্ভব এ উপায়ে। সিনেমাটি মুক্তির পর মৌলিক কণা দিয়ে বস্তু তৈরি বাস্তবজগতে এখনো সম্ভব না হলেও ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরি। যে যন্ত্র এ কাজ করছে, তার নাম থ্রি-ডি প্রিন্টার।

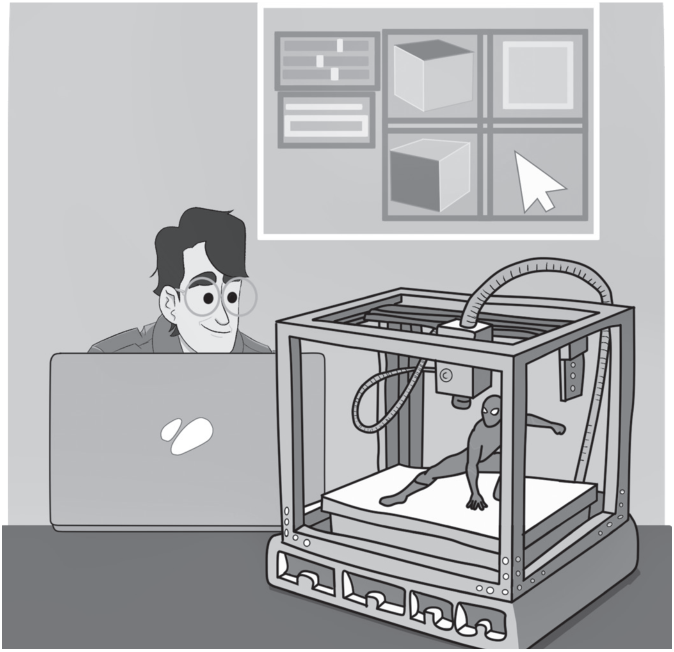

থ্রি-ডি প্রিন্টার দিয়ে শুধু খাদ্যদ্রব্য বা নানা কলকবজা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে তাই-ই নয়, এর মাধ্যমে প্রিন্ট করে তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেগুলো মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনও করা হচ্ছে। বিস্মিত হওয়ার মতো আরও খবর হচ্ছে, থ্রি-ডি প্রিন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রিন্ট করে নির্মাণ করা হয়েছে বাসস্থানের বাড়ি। মাত্র চার হাজার ডলার ব্যয়ে প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে নির্মাণ করা সম্ভব স্বপ্নের বাড়ি! এমনকি এই প্রিন্টারের মাধ্যমে বানানো যেতে পারে গাড়ির কাঠামো।

১৮৮৮ সালে একটি সায়েন্স ফিকশন বই লিখে এডওয়ার্ড বেলামি বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দেন। প্রকাশের পরপরই বেস্টসেলার তালিকায় তিন নম্বরে চলে আসে সেই গ্রন্থ। বইটির নাম ‘লুকিং ব্যাকওয়ার্ড’। বইয়ের কাহিনিতে বর্ণিত কল্পলোকের নাগরিকরা ব্যবহার করেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট কার্ড। তারা কাগুজে নোটের বদলে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সাধ-আহ্লাদ মেটান। সেই ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রেডিট খরচের মাধ্যমে কেনাকাটা সম্ভব হয়। বর্তমানকালের ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এটিএম কার্ড—সবই সেই কল্পনার বাস্তবায়ন। এ যুগে দাঁত মাজার গুল থেকে শুরু করে ডায়মন্ডের দুল যা-ই কিনি না কেন, বিল পরিশোধে এসব কার্ড আমাদের নিত্যসঙ্গী।

পৃথিবী গ্রহে বিরল প্রতিভার অধিকারী হাতেগোনা কয়েকজন মানুষের মধ্যে ফরাসি ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার জুল ভার্ন অন্যতম। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসগুলো শুধু আনন্দের খোরাক নয়; তথ্য ও প্রযুক্তির উৎস। তাঁর অন্তত দুই হালি কল্পনা এখন আমরা বাস্তবে বড়ো আবিষ্কার হিসেবে দেখতে পাই। সেসবের মধ্যে অন্যতম সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় জুল ভার্নের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি’। বইটিতে তিনি বিদ্যুৎচালিত সাবমেরিনের বর্ণনা দিয়েছেন। বইতে দেখা যায়, রহস্যময় চরিত্র ক্যাপ্টেন নিমো তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় তৈরি করেন ‘নটিলাস’ নামের সাবমেরিন।

সে সময়ে অনেক বিজ্ঞানী সাবমেরিন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন কিন্তু জুল ভার্নের বইয়ে সেটির কারিগরি ও কাঠামোগত যে বর্ণনা দেওয়া হয়, তা সবার কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। বইটি সাবমেরিন তৈরির গবেষণায় মত্ত বিজ্ঞানীদের তাড়নায় স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। বইয়ে বর্ণিত সাবমেরিন অনুপ্রেরণা জোগায় আমেরিকান যন্ত্রপ্রকৌশলী ও নৌবাহিনীর স্থপতি সাইমন লেক-কে। পরবর্তীকালে নিরলস গবেষণার ফলে ১৮৯৮ সালে সর্বপ্রথম উন্মুক্ত সাগরবুকে চলাচল শুরু করে তাঁর গবেষণালব্ধ সাবমেরিন, যার নাম 'আর্গোনট'।

সাগরের ডুবোজাহাজের পর আকাশের হেলিকপ্টার নিয়ে বলা যাক। আমরা জানি, বিশ্বখ্যাত 'মোনালিসা' ছবির চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রায় পাঁচশ বছর আগে হেলিকপ্টারের নকশা এঁকেছিলেন। তাঁর নোটবুক থেকে যে উড়ুক্কু যন্ত্রের ডিজাইন পাওয়া গেছে, সেটির নাম এরিয়াল স্ক্রু। এ যন্ত্রটিই হেলিকপ্টারের পূর্বপুরুষ বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নোটবুকে উড়ুক্কু যন্ত্রের স্কেচের পাশে ভিঞ্চি লিখে গেছেন, কীভাবে সেটি উড়তে সক্ষম হবে। তবে তিনি নিজে কখনো যন্ত্রটি তৈরি করে পরীক্ষা করেননি।

হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে পরে জুল ভার্ন অসাধারণ কল্পনাশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সময়ে হেলিকপ্টার তৈরির যে ধারণা বিজ্ঞানীদের ছিল, সেসব ধারণাকে তিনি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যান। হেলিকপ্টার কয়লার মাধ্যমে চালানোর প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে জুল ভার্ন প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সাহায্যে তা চালানোর ধারণা দেন। এগুলো তিনি তুলে ধরেন তাঁর একটি বইয়ের মাধ্যমে—'রোবার দ্য কনকুয়েরার'। বইটির প্রধান চরিত্র তৈরি করে একটি যন্ত্রযান, যা পাখার সাহায্যে চলে। এটি থেকেই উৎসাহিত হয়েছিলেন আধুনিক হেলিকপ্টারের আবিষ্কারক রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইগর সিকোরস্কি।

পৃথিবীখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসেবে যে আর্থার সি ক্লার্কের নাম আমরা জানি, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের রয়েল এয়ার ফোর্সে রাডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করেন। সে সময় তাঁর মাথায় অবিস্মরণীয় একটি আইডিয়া আসে। তিনি কল্পনা করেন, চাঁদের মতো কোনো উপগ্রহ যদি প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সহজেই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবী থেকে বেশি দূরে বলে তিনি কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহের কথা চিন্তা করেন। সেই সঙ্গে স্যাটেলাইট বসানোর জন্য ভূ-ত্বক থেকে প্রায় ২২ হাজার ২৩৬ মাইল বা ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত জিওস্টেশনারি বা জিওসিনক্রোনাস অরবিটের কথা ভাবেন।